



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 554 - 560

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে মহররম

সুকান্ত ঘোষ

(SACT-1), ড. গৌর মোহন রায় কলেজ

গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : sukantaghosh281@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Moharram,
Karbala,
Dr. Osman Gani,
Radhacharan Gope,
Jangnama, Shah
Garibullah,
Shia, Puthi,

Abstract

The greatest contribution of Muslim poets and writers in terms of subject diversity in medieval Bengali literature is the Dobhashi Puthi literature. This Dobhashi Puthi literature is an important part of Bengali literature. Before the invention of printing, this Puthi was universal and part of our tradition. There was a time when Puthi was read in every house. This literature is written in a combination of Arabic, Urdu, Persian and Hindi languages. Its period was from the eighteenth to the nineteenth century. Both the authors and readers of this literature were the Muslim community. This literature is also called Islamic Bengali literature or Islamic Puthi literature, Islamic Bengali literature covers a large part of the Bengali language and literature. This literature breathed new life into the Bengali language. It quenched the literary thirst of millions of ordinary Bengalis. Although this genre is now almost extinct. Eminent Islamic scholar Dr. Osman Gani says that this Islamic puthi literature was created in the 18th century, it flourished in the 19th century, it declined in the 20th century and it is almost extinct in the 21st century. A large part of this interpretive puthi literature covers the tragic events of Moharram or Karbala. Muslim poets and writers have written one after another interpretive puthi literature based on the tragic events of Karbala or Moharram. In the 18th century, Shah Garibullah, the creator of interpretive puthi literature, composed 'Jangnama'. Then, following him, other poets who became famous for writing poetry in the interpretive style from the 18th to the 19th centuries include Radhacharan Gope, Mir Manohar, Wajid Ali, Janab Ali. Muhammad Munshi, Saad Ali, Abdul Wahab, etc.

Discussion

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মৃত্যুর (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ) পর গণতান্ত্রিক পদ্ধতির খলিফাতুল্লের সূচনা হয়। হজরত আবু বকর প্রথম খলিফা হিসাবে নির্বাচিত হন। এরপর যথাক্রমে হজরত ওমর ও হজরত ওসমান খলিফা হিসাবে আসীন হন। হজরত আলী হন চতুর্থ খলিফা। এই যুগকে খলিফা যুগের শ্রেষ্ঠ যুগ বা ‘খলিফায়ে রাশেদীন’ হিসাবে বিবেচনা করা

হয়।^১ হজরত আলীর মৃত্যুর পর মোয়াবিয়া পঞ্চম খলিফা হিসাবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির খলিফাতুল্লের পরিবর্তে উমাইয়া রাজত্বের বংশানুক্রমিক খলিফাতুল্লের সূচনা করেন। উমাইয়া বংশের এই আধিপত্যবাদী উন্মাদনায় ‘ইসলামি খিলাফত আন্দোলনের’ করণ পরিণতি হল ‘কারবালা হত্যাকাণ্ড’ (৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ)। প্রসঙ্গত পৃথিবীর ৩২°৪০’ উত্তর ও ৪৪° পূর্ব অক্ষাংশে অবস্থিত এক বিতর্কিত ও পবিত্রভূমি হিসাবে চিহ্নিত স্থান হল কারবালা।^২ ইরাকের রাজধানী বাগদাদ শহর থেকে প্রায় ৯৬ কিমি দূরে এর অবস্থান।^৩ এখানে বসবাসকারী মুসলমানরা অধিকাংশই শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। এই শহরের পূর্ব দিকে বিখ্যাত প্রাচীন ফোরাতে নদী প্রবাহিত। বর্তমানে যার নাম ইউফ্রেটিস নদী। ফোরাতে নদীর তীরে এই কারবালা প্রান্তরে হজরত মহম্মদের দৌহিত্র এবং চতুর্থ খলিফা হজরত আলির পুত্র হজরত হোসেনকে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর এক অসম যুদ্ধে হত্যা করা হয়।^৪ ইসলামের ইতিহাসে তথা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘটনা ‘কারবালা হত্যাকাণ্ড’ নামে পরিচিত। ৬১ হিজরীর মহররম মাসের ১০ তারিখে এই বিষাদময় ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বলে একে ‘মহররম’ বা ‘আশুরা’ নামে অভিহিত করা হয়।^৫ কারবালা প্রান্তরে সংঘটিত এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ইসলামের ইতিহাসে এক বিষাদময় অধ্যায় রূপে বিবেচিত। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক ‘কারবালা হত্যাকাণ্ড’কে স্মরণ করে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই নিজ নিজ ভাষায় সাহিত্যে এই বিষাদময় কাহিনিকে বিধৃত করা হয়েছে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। কারবালার এই বিষাদময় ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইরাক থেকে বহুদূরে অবস্থিত এই বাংলাতে ‘বিষাদসিন্ধু’র মতো যেমন বৃহৎ উপন্যাস তথা গদ্য সাহিত্য রচিত হয়েছিল ঠিক তেমনি কারবালা বা মহররমের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল অসংখ্য পুঁথি সাহিত্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটা বিশাল অংশ জুড়ে আছে ইসলামী বাংলা সাহিত্য। যেটি ছাড়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস খণ্ডিত বা বিকৃত ইতিহাস বলে গণ্য করা হয়। এই ইসলামী বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা ছিল ইসলামী পুঁথি সাহিত্য। যে সাহিত্য বাংলা ভাষায় নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল, লক্ষ লক্ষ সাধারণ বাঙালী জনগণের সাহিত্য রস পিপাসা মিটিয়েছিল। পাশাপাশি এই সাহিত্য থেকে তৎকালীন বাংলার সমাজজীবনের একটি সুন্দর এবং অপূর্ব ছবি আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। যদিও এই ধারাটি বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ডঃ ওসমান গনী বলেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ইসলামী পুঁথি সাহিত্যের সৃষ্টি, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তার রমরমা, বিংশ শতাব্দীতে তার ভাঁটার টান এবং একবিংশ শতাব্দীতে তা লুপ্তপ্রায়।^৬

বাংলা সাহিত্যে মহররম বা কারবালার কথা বলতে গেলে প্রথমেই চলে আসে পুঁথি সাহিত্যের কথা। বাংলা সাহিত্যের একটা বিশাল অংশ জুড়ে আছে পুঁথি সাহিত্য। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ইসলামি পুঁথি সাহিত্য। ইসলাম এবং ইসলামের বিজয় গাঁথাকে কেন্দ্র করে মুসলিম কবি, লেখক, সাহিত্যিকরা একের পর এক পুঁথি সাহিত্য রচনা করেছিলেন, ফলস্বরূপ বাংলায় ইসলামিক পুঁথি সাহিত্যের এক বিশাল ভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল যা তৎকালীন বাংলার অল্প শিক্ষিত, শিক্ষিত, সকল মুসলিম জনগণের অবসর বিনোদন এবং সাহিত্য রস-পিপাসা মিটিয়েছিল। ইসলামের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সমস্ত পুঁথি সাহিত্যগুলি রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে যেমন ছিল প্রণয়-গাঁথা কাব্য তেমনি ছিল বিষাদ-গাঁথা কাব্য। বিষাদ-গাঁথা কাব্যে কারবালার ঘটনা তথা মহররম বেশ গুরুত্ব সহকারে তার জায়গা করে নিয়েছে। বিশাল পুঁথি সাহিত্যের ভিতরে কিভাবে কারবালার ঘটনা বা কারবালার কাহিনি স্থান পেয়েছে এবং কারবালা বা মহররম-কেন্দ্রিক কি কি পুঁথি আবিস্কৃত হয়েছে – এসব বিষয়গুলি আলোচনার আগে পুঁথি সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা আবশ্যিক।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিষয় বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে মুসলিম কবি, সাহিত্যিকদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল ইসলামী পুঁথি সাহিত্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া-ভুগলী-মুর্শিদাবাদ-কলকাতাসহ পূর্ববঙ্গের ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে বেশ কিছু মুসলমান কবি, সাহিত্যিক ইসলামের বিভিন্ন ঘটনাকে যথা প্রণয়কাহিনি, বিষাদময় কাহিনি, ইসলামের বিজয় কাহিনি এবং ধর্মীয় ইতিহাসকে সামনে রেখে আরবি-হিন্দি-উর্দু-ফার্সি শব্দ মিশিয়ে বাংলা ভাষায় পদ্যের আকারে এক শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান জনগণকে কাব্যরসে তৃপ্ত করেন। এই শ্রেণীর সাহিত্যকেই ‘ইসলামী পুঁথি সাহিত্য’ বলা হয়ে থাকে। যেহেতু এই শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যে বাংলা শব্দের পাশাপাশি আরবি-হিন্দি-উর্দু-ফার্সি শব্দের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় তাই এই শ্রেণীর সাহিত্যকে ‘দোভাষী পুঁথি সাহিত্য’ বলা হয়ে থাকে।^৭ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ছাপাখানা

আবিষ্কার হবার আগে পর্যন্ত সমস্ত গ্রন্থই ছিল পুঁথি বা হাতে লেখা পুস্তক। ‘পুস্তক’ শব্দের অপভ্রংশ হল পুঁথি। এক কথায় Manuscript এর বাংলা পরিভাষা হল পুঁথি।^৭ যদিও এই ধরনের সাহিত্যকে কেউ কেউ বলে থাকেন মুসলমানী বাংলা সাহিত্য বা ইসলামি বাংলা সাহিত্য। পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত জায়গায় বাংলা ভাষার উপর আরবি-হিন্দি-উর্দু-ফার্সি প্রভৃতি শব্দের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, মূলত সেই সমস্ত অঞ্চলেই ইসলামি পুঁথি সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল। এর পশ্চাতে মূলত বেশ কতকগুলি কারন দায়ী ছিল। প্রথমত, শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান শাসক মুর্শিদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে নবাবী শাসনের সূচনা করলে ধীরে ধীরে মুর্শিদাবাদ একটি শিয়া কলোনিতে রূপান্তরিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলায় ইসলামের প্রসারের যে কয়েকটি ছক বাঁধা সাধারণ ব্যাখ্যা আছে তার মধ্যে অন্যতম হল মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার ধারণা। বাংলায় অবাঙালী শিয়া মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার কারনে এখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাংলা ভাষার উপর শাসকের নিজস্ব ভাষা ফার্সির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পণ্ডিতরা যাকে বলে থাকে সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ। দ্বিতীয়ত, মুর্শিদকুলি খাঁর বাংলা তথা মুর্শিদাবাদে নবাবী শাসন শুরু করার অনেক আগে থেকেই হুগলী বন্দর মারফৎ ভারতবর্ষের সাথে বহির্বিশ্বের বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিম এশিয়ার দেশ গুলির সাথে একটা সুষ্ঠু বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সেই উদ্দেশ্যে এই সমস্ত দেশ থেকে বহু বণিক ও ধনী ব্যক্তির বাবসার উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে আসে। যারা প্রায় সকলেই ছিল শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। এইভাবে হুগলী একটা শিয়া উপনিবেশে পরিণত হয়। স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ভাষার উপর তাদের আরবি-ফার্সি শব্দের একটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তর ভারতের উর্দু-হিন্দি ভাষী শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান মানুষজন বাংলায় এসে উপস্থিত হলে স্বাভাবিকভাবেই দূরতরফেই অর্থাৎ বাঙালী জনগন হিন্দি-উর্দু ভাষার দ্বারা এবং অবাঙালী শিয়া মুসলমানরা বাংলা ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়। তৃতীয়ত, শিয়া মুসলমানদের আগমনের সাথে সাথে অসংখ্য সুফি সাধকগণ মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এসেছিলেন ইসলামের অতিন্দ্রীয়বাদী দর্শন প্রচার করতে। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা বাংলায় গড়ে তুলেছিলেন ধর্ম প্রচারের বিভিন্ন কেন্দ্র। তাদের সাম্যবাদী নীতির দ্বারা স্থানীয় জনগণ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় এবং তাদের বাংলা ভাষার উপর আরবি-ফার্সি ভাষার একটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর সুফিদের মধ্যে ইসমাইল গাজি বা বড় খাঁ গাজি নামক এক সুফি সাধকের কথা জানা যায়, যাকে কেন্দ্র করে ভুরশট-মান্দারন অঞ্চলের মুসলমান সমাজের উপর আরবি-ফার্সি ভাষার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।^৮ চতুর্থত, মুঘল আমলে বাংলাদেশ ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়ায় বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্কৃতির পাশাপাশি বাংলা ভাষার উপরও মুঘল সংস্কৃতির একটা গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এই সমস্ত কারনে পশ্চিমবঙ্গ সহ পূর্ববঙ্গের নগরকেন্দ্রিক জীবনে বিশেষ করে বাংলা ভাষার উপর আরবি-হিন্দি-উর্দু-ফার্সি শব্দের প্রভাব এতো বেশি লক্ষ্য করা যায় যে, তাকে আর বিদেশী ভাষা বলে উপেক্ষা করা যায় না। ধীরে ধীরে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য এইসব বিদেশী শব্দের ব্যাপক ব্যবহার করতে থাকে। এমতাবস্থায় আরবি-ফার্সি শব্দ মিশিয়ে বাংলা ভাষাতে সেই অঞ্চলের মানুষজনকে কাব্য রসে তৃপ্ত করার জন্য এক শ্রেণীর কবি, সাহিত্যিকরা এগিয়ে আসেন এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত হয় হাতে লেখা ‘ইসলামি পুঁথি সাহিত্য’। এক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বাসিন্দা শাহ গরীবুল্লাহ। যাকে ‘ইসলামি পুঁথি সাহিত্যের জনক’ও বলা হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে তাঁকে অনুসরণ করে আরও অনেক কবি, সাহিত্যিক অসংখ্য পুঁথি সাহিত্য রচনা করেন। সেই সমস্ত ইসলামি পুঁথি সাহিত্যের বিরাট একটা অংশ জুড়ে মহররমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এই মহররমকে বিষয়বস্তু করেই অসংখ্য পুঁথি সাহিত্য রচিত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে বিশিষ্ট ইসলামিক পণ্ডিত ডঃ ওসমান গনী বলেন “কারবালার সক্রুণ ইতিহাস সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে এক বিশাল অংশকে অধিকার করে আছে। বিশেষ করে মুসলিম মানসে বা মুসলিম সাধারণ সমাজে কারবালার স্থান আজও বহু উচ্চে। কেননা এই কারবালাকে কেন্দ্র করে নবী বংশের নিধনযজ্ঞ সূচিত হয়েছিল। যা মুসলিম সমাজ কোনো দিনই ভুলতে পারে না। বিশাল মুসলিম পুঁথি সাহিত্যের ভিতর দিয়ে কারবালার নানা কাহিনী নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে। যাতে অনেক সত্য মিথ্যা ও অতিরঞ্জন স্থান পেয়েছে।”^৯ স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের ইতিহাসে এবং ইসলামিক পুঁথি সাহিত্যে কারবালার বিষাদময় ঘটনা অনিবার্য ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। ঐতিহাসিক কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগ থেকে বাংলাদেশে এক বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার যেমন গড়ে উঠেছে ঠিক

তেমনি বাংলার লৌকিক সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়েছে। মর্সিয়া সাহিত্য এবং জারীগান তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ বা এক অনবদ্য লৌকিক শিল্প প্রচেষ্টা।^{১১}

এছাড়াও কারবালা যুদ্ধের বিষাদময় করুণ কাহিনিকে নিয়ে বাংলা ভাষায় পুঁথি সাহিত্য রচনা করেন মুহম্মদ খান এবং শেখ ফয়জুল্লাহ নামে দুই কবি ব্যক্তিত্ব। মুহম্মদ খান বাংলার শিক্ষিত সমাজে অত্যন্ত সুপরিচিত এক কবি ব্যক্তিত্ব। যিনি ছিলেন যথার্থ কাব্য প্রতিভার অধিকারী। অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েন এর মতে, কারবালায় ঘটনার উপর রচিত অন্যতম প্রাচীন পুঁথি সাহিত্য হল মুহম্মদ খানের ‘মুক্তল হোসেন’ (১৬৪৫-১৬৪৬)। এটি এতটাই জনপ্রিয় যে, এখনও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করা হয়।^{১২} তাঁর এই পুঁথি সাহিত্যটি যদিও একটি ফারসি কাব্যের ভাবানুবাদ, তবুও এতে তাঁর নিজস্ব মৌলিক চিন্তাভাবনা স্থান পেয়েছে। এই কাব্যটি ছিল তাঁর কবি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁর এই পুঁথি সাহিত্যটি এগারোটি পর্বে বিভক্ত। যথা - আদি পর্বের নাম ফাতিমা পর্ব, দ্বিতীয় পর্বের নাম আসহাব পর্ব, তৃতীয় পর্বের নাম হাসান পর্ব, চতুর্থ পর্বের নাম মুসলিম পর্ব, পঞ্চম পর্বের নাম যুদ্ধ পর্ব, ষষ্ঠ পর্বের নাম হোসেন পর্ব, সপ্তম পর্বের নাম স্ত্রী পর্ব, অষ্টম পর্বের নাম দূত পর্ব, নবম পর্বের নাম অলীক পর্ব, দশম পর্বের নাম এজিদ পর্ব এবং একাদশ পর্বের নাম অন্ত্য পর্ব। তাঁর এই ‘মুক্তল হোসেন’ কাব্যটির পরিকল্পনা বাংলা মহাভারতের অনেকটা অনুরূপ বলা যেতে পারে। মহাভারত যেমন আঠারোটি পর্বে বিভক্ত ঠিক তেমনি ‘মুক্তল হোসেন’ও একই রকম ভাবে এগারোটি পর্বে বিভক্ত। মূলত ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে তাঁর এই কাব্যটি রচিত।^{১৩}

অনুরূপভাবে পুঁথি সাহিত্যের ধারায় নাম লিখিয়ে শেখ ফয়জুল্লাহ রচনা করেন ‘জয়নবের চৌতিশা’। তাঁর এই কাব্যে ইমাম হোসেনের পত্নী জয়নাবের বিলাপ বর্ণিত হয়েছে। তাঁর এই পুঁথিটির কিছু অংশ মুহম্মদ খানের ‘মুক্তল হোসেন’ এর সাথে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা গেলেও পুঁথিটি ‘মুক্তল হোসেন’ এর মতো বিরাট কাব্য নয়, কারবালা কাহিনির একটি ক্ষুদ্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে এটি রচিত।^{১৪} যদিও এটি তাঁর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রচনা। এছাড়াও দৌলত উজীর বাহরাম খান নামক অপর এক কবির রচিত ‘জঙ্গনামা’ নামক এক পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে।^{১৫}

বাংলা নাট্যকোষ গ্রন্থের লেখক সেলিম-আল-দীনের মতে, এই সমস্ত পুঁথি সাহিত্যগুলিকে আদর্শ করে পরবর্তীতে (সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে) বাংলাদেশে আরও অনেক পুঁথি সাহিত্য রচিত হয় যেগুলি সাধারণত ‘জঙ্গনামা’ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। ‘জঙ্গনামা’ শ্রেণীর এই পুঁথিগুলির বিষয়বস্তু যুদ্ধের কাহিনি হলেও শুধুমাত্র কারবালা যুদ্ধের কাহিনিই সেখানে স্থান পেয়েছে। কারন বাংলার মুসলিম সমাজ ‘জঙ্গনামা’ শ্রেণীর যে কাব্যগুলিতে শুধুমাত্র কারবালা যুদ্ধের ঘটনাই স্থান পায় সেগুলিকেই ‘জঙ্গনামা’ বলে মর্যাদা দেয়। ‘জঙ্গনামা’র বিশেষত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন - এগুলি আসলে মুসলমান কবিদের দ্বারা রচিত যুদ্ধ (কারবালা যুদ্ধ) কাব্য।^{১৬}

পরবর্তীতে কবি হায়াৎ মাহমুদ এর ‘জারি জঙ্গনামা’ নামক এক পুঁথি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যেটির রচনা কাল ১৭২৩ খ্রিষ্টাব্দ।^{১৭} বাংলা শোক কাব্য বা মর্সিয়া সাহিত্যের ধারায় মুহম্মদ খানের ‘মুক্তল হোসেন’ এর পরেই এর স্থান। পরবর্তীকালে ‘শহীদ-ই-কারবালা’ ও ‘সখিনা বিলাপ’ নামক দুটি খণ্ডিত পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে। পুঁথি দুটির লেখক জাফর নামক অজ্ঞাতনামা এক কবি। পুঁথি দুটি আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় আকারে বড় ছিল। এর মধ্যে ‘শহীদ-ই-কারবালা’ নামক পুঁথিটি ছিল ‘সখিনা বিলাপ’ এর থেকে আকারে বড়।^{১৮} কারবালা প্রান্তরে ইয়াজিদ বাহিনীর সাথে এক অসম যুদ্ধে হোসেনের শাহাদাত বরণ এবং তাঁর মাতা ফাতেমার বিলাপ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে ‘শহীদ-ই-কারবালা’ নামক পুঁথিটিতে। অন্যদিকে হোসেনের পুত্র কাসেম এবং সখিনার বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ জনিত করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে ‘সখিনা বিলাপ’ নামক পুঁথিটিতে। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে হামিদ নামক এক কবি বাংলা মর্সিয়া সাহিত্যের ধারায় যোগ করেন ‘সংগ্রাম হুসন’ নামক এক কাব্য।^{১৯}

পূর্ববাংলার পাশাপাশি পশ্চিম বাংলাতেও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইসলামী বাংলা সাহিত্য তথা ইসলামী পুঁথি সাহিত্য রচনার যে ধারা সূচিত হয় তাতে অনেক কবি, সাহিত্যিক পুঁথি সাহিত্য রচনা করেছিলেন। এই ধারার প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন তৎকালীন হুগলী জেলার বালিয়া পরগনাভুক্ত (বর্তমান হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার পাতিহাস গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত) হাফেজপুর নিবাসী শাহ্ গরীবুল্লাহ। তিনি ইসলামী বাংলা ভাষার সাথে উর্দু, হিন্দি, ফার্সি শব্দ

মিশিয়ে ‘জঙ্গনামা’ কাব্য রচনা করেন। তাঁর এই কাব্যে শুধুমাত্র কারবালার ঘটনা বর্ণিত আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলার মুসলমান সমাজ সেই সমস্ত গ্রন্থগুলোকেই ‘জঙ্গনামা’ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়, যেখানে শুধুমাত্র কারবালার ঘটনাই স্থান পায়। সে দিক থেকে তাঁর এই ‘জঙ্গনামা’ কাব্যটি প্রকৃত অর্থেই জঙ্গনামা। এই ধারা অনুসরণ করে রাঢ় বঙ্গের (উত্তর রাঢ়ের) হিন্দু কবি রাধাচরণ গোপ ‘ওফাৎনামা’ এবং ‘ইমামের কেছা’ নামক দুটি জঙ্গনামা কাব্য রচনা করেন।^{২২} পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া-ছগলী সীমান্তের ভুরগুট কানপুর পরগণা থেকে জনাব আলীর ‘শহীদে কারবালা’ এবং মুন্শি ছাদ আলী ও মুন্শি আব্দুল ওয়াহাবের ‘গঞ্জে শহীদে কারবালা’ এই ধারার অন্যতম উল্লেখযোগ্য সংযোজন। উত্তর আধুনিক কালের মুহম্মদ ইসহাক উদ্দিনের ‘দাস্তান শহীদে কারবালা’ এবং কাজী আমিনুল হকের ‘জঙ্গে কারবালা’ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ছিলেন যথাক্রমে বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর ও চট্টগ্রামের বাসিন্দা।^{২৩} নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পুঁথির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হল -

‘দাস্তান-শহীদে-কারবালা

মুন্সী এছহাক উদ্দিন

১৩৬৪ সাল’

কারবালাকে কেন্দ্র করে যত পুঁথি রচিত হয়েছে তার মধ্যে এটি অন্যতম এবং ব্যতিক্রম এক পুঁথি। কারণ এই পুঁথিতে কারবালার সমগ্র ইতিহাস বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কারবালা কেন্দ্রিক আরবি-ফার্সি সাহিত্যের মূল ঘটনার সারাংশ নিয়ে ইহা রচিত, তাই বাংলার পুঁথি সাহিত্যে এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক পুঁথি।^{২৪} এই পুঁথিতে যে সমস্ত বয়ানগুলির পরিচয় পাওয়া গেছে, সেগুলি হল - হজরত আব্দুল মুগ্লাফের ছোলতানাতের বয়ান, হাশেম ও উমাইয়া, আব্দুল মুত্তালিব ও হরব, হজরতের নবুয়ত ও প্রথম অধ্যায়, হজরত রসুল করিমের দোয়া, হজরত ফাতেমার ওফাত, হজরত আলী মোয়াবিয়া ও হজরত হাসান, হজরত হাসান ও এজিদ, মধু ও খেজুর দ্বারা হজরত হাসানকে বিষপানের প্রচেষ্টা, হজরত ইমাম হাসান মৌসল শহরে, হজরত আবদুল্লাহ দামেস্ক থেকে মদিনায়, হজরত ইমাম হাসানের শাহাদাত বরণ, জায়েদার মউত, হজরত হোসেনের কাছে মোয়াবিয়ার পত্র, আমীর মোয়াবিয়ার ওফাত, মোয়াবিয়া ও হোসেনের মত, ইমাম হোসেনের নিকট ইয়াজিদদের বয়ত তলব, হজরত ইমাম হোসেনের মক্কা রওনা, ইমাম হোসেনকে কুফাতে দাওয়াত, কারবালা প্রান্তরে শহীদগণ, ইমাম হোসেনের শাহাদাত এবং সীমারের শেষ অবস্থা।^{২৫}

‘শাহাদাতনামা

মুন্সী মাজহার আইল

১৩৩৬ সাল’

‘শাহাদাতনামা’ ছিল বাংলাদেশের গওসিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত শহীদে-কারবালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত রূপ। এই পুঁথিতে গ্রন্থকার বলেছেন যে, কারবালার ঘটনা ছিল নিয়তির হাতে পূর্ব নির্ধারিত এবং কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসেনের শহীদদের ঘটনা মররম মাসের গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।^{২৬}

‘এমাম হসন ও হোসেন

১৩২৬ সাল’

পুঁথিটির লেখকের নাম জানা যায় না। মনে করা হয় পারসিক গ্রন্থ ‘রওজতোশ শোহাজা’ নামক এক গ্রন্থ থেকে এর বিষয়বস্তু নেওয়া হয়েছে।^{২৭} পুঁথিটিতে বিষাদময় কারবালা ঘটনার বিশদ বিবরণ বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এখানে একটি নতুন কাহিনির অবতারণা করা হয়েছে। সেটি হল হজরত যুবাইয়ের নামক এক বিখ্যাত সাহাবীর পুত্র আবদুল্লাহর এক পরমাসুন্দরী স্ত্রী ছিল, যাকে সিরিয়ার শাসক ইয়াজিদ বিবাহ করার জন্য কূটনৈতিক জাল বিছিয়ে তাকে তার স্বামীর কাছ থেকে আলাদা করে দেয় এই ভেবে যে তাহলে তাকে সহজেই বিবাহ প্রস্তাব দিয়ে বিবাহ করা যাবে। কিন্তু সে ইয়াজিদকে বিবাহ না করে ইমাম হোসেনকে বিবাহ করে। ফলস্বরূপ ইয়াজিদ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে এবং তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে ইমাম হোসেনের উপর। তারপর থেকেই ইয়াজিদ ইমাম হোসেনকে বধ করার পরিকল্পনা করে। যার

ফলশ্রুতিতে সংঘটিত হয় ‘কারবালা যুদ্ধ’। তবে পণ্ডিতরা মনে করেন ইতিহাসে এই ঘটনার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, এটি সম্পূর্ণ-ই কাল্পনিক কাহিনী।

‘ছহি বড় জঙ্গনামা

শেখ ইয়াকুব

১৩৬৮ সাল’

ভালো এবং খারাপ উভয় প্রকার মানুষেরই যে কোন জাত থাকে না, তা শেখ ইয়াকুব রচিত এই পুঁথিটিতে খুব সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে। যে ইমাম হোসেন সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে পরম পূজনীয় ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন সেই মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকের হাতেই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, শুধু তাই নয়, তাঁর মৃত দেহকে পর্যন্ত শ্রদ্ধা জানানোর প্রয়োজন বোধ করে নি বরং তাঁর মৃতদেহ থেকে মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। অন্যদিকে তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মাথাটিকে সম্মান জানিয়েছিলেন একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ।^{২৮}

‘আসল সহিদে কারবালা

শেখ মহম্মদ মুঙ্গী

১৩১৯ সাল’

এটিও একটি কারবালা কেন্দ্রিক পুঁথি এবং দাস্তান-শহীদে-কারবালার মতোই বিশাল এক পুঁথি। এখানেও একই ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আসলে সেই সময়ে একই বিষয়ের উপর একাধিক পুঁথি রচিত হবার একটি প্রথা ছিল।^{২৯} শুধুমাত্র মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকরাই যে কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাধিক পুঁথি সাহিত্য রচনা করেছেন তাই নয়, অমুসলমান কবি ও সাহিত্যিকরাও এই বিষয়কে কেন্দ্র করে একাধিক পুঁথি সাহিত্য রচনা করেছেন। এর মধ্যে কবি রাধাচরণ গোপ বা রাধা গোপের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলামি বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তিনি তাঁর নিজস্ব ছন্দে ইসলামি বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, নাম দিয়েছেন ‘আফতনামা’ ও ‘ইমামের জঙ্গ’।^{৩০} এভাবেই তিনি বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ের সূচনা করেছিলেন এবং তিনি নিজে ছিলেন হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের সার্থক কবি।

Reference:

১. মোহা., আল-মুস্তানছির বিল্যাহ, ইসলামের ইতিহাস, ফেমাস বুকস, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ১৫৪
২. চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র, কারবালার কথা, কারিগর, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. প্রাসঙ্গিকী অংশ দ্রষ্টব্য
৩. তদেব, পৃ. প্রাসঙ্গিকী অংশ দ্রষ্টব্য
৪. মোহা., আল-মুস্তানছির বিল্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩
৫. জাফর, আবু, মুসলিম উৎসব, সূচনা প্রকাশনালয়, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২৯
৬. গনী, ওসমান, ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৯
৭. মুহম্মদ, আব্দুল জলিল, শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১
৮. তদেব, পৃ. ৬
৯. তদেব, পৃ. ৯
১০. গনী, ওসমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯
১১. চৌধুরী, আবু আহসান, লোকসংস্কৃতি বিবেচনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৮৫
১২. গোলাম, সাকলায়েন, বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ. ৩৭
১৩. হক, মুহম্মদ এনমুল, মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পাকিস্থান পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৫৭, পৃ. ১৯১
১৪. গোলাম, সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮
১৫. তদেব, পৃ. ৩৭

১৬. আল দীন, সেলিম, বাংলা নাট্যকোষ, গণসাহায্য সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৬২
১৭. গোলাম, সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
১৮. তদেব, পৃ. ২০৫
১৯. তদেব, পৃ. ২০৫
২০. তদেব, পৃ. ৩৭
২১. সাদিক, মহম্মদ(সম্পা.), শাহ গরীবুল্লাহ সংস্কৃতি মেলা ও প্রদর্শনী ১৯৮৯ স্মারক পত্রিকা, পৃ. ১৬
২২. গোলাম, সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭, ৩৮
২৩. তদেব, পৃ. ৩৮
২৪. তদেব, পৃ. ২১০, ২১১
২৫. তদেব, পৃ. ২১০, ২১১
২৬. তদেব, পৃ. ২১২
২৭. তদেব, পৃ. ২১২, ২১৩
২৮. তদেব, পৃ. ২১৩
২৯. তদেব, পৃ. ২১৩
৩০. তদেব, পৃ. ২১৬